Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 772 - 787
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 772 - 787
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নির্বাচিত রবীন্দ্র সাহিত্যে নিন্দাসূচক শব্দ ও অপভাষার প্রয়োগ

ড. মধুমিতা আচার্য
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (স্বশাসিত)
রাঘবপুর ক্যাম্পাস
Email ID : macharya1973@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Rabindranath Tagore, literature, slangs, bad words, humor, ethics, character, reality.

Abstract

Rabindranath Tagore is not only a famous author but a great part of our culture and heritage. In his literature there are also the use of slangs but these are used not for criticism, nor for cheap popularity but for the sake of providing authenticity to the characters. The slangs are only used in the dialogues of the characters.

Rabindranath Tagore was born in an educated liberal family of the nineteenth century. He believed in good values, but still a lot of slangs have been used in the short stories and novels. In drama, especially in the humorous short dramas, there are plenty of slangs which have been used for creating a ridiculous situation. The characters and the situations provide the laughter element in a drama. The duty of a good creator is to establish the character and the events in a believable manner. No doubt, Rabindranath has successfully created believable characters and situations in his writings.

Rabindranath wrote many devotional songs, poems and essays. He is the founder of Bramhacharya Bidyalay in Santiniketan, which was converted into Bishwavarati Bishwabidayalay. In the Shantiniketan Ashram he was called Gurudeva. But we are also able to gather a long list of slangs in his literature. This was not a controversy, but it's a great way to ascertain the versatility of our beloved poet, who so realistically included the smallest detail.

Rabindranath went to East Bengal for the maintenance purpose of his father's zamindari. In East Bengal he saw the rural people, who are fond of using slangs in their day to day life. So when Rabindranath created stories in the background of East Bengal, he used the slangs to make it more real. With the use of these words the life of the lower strata of the society was established as truly as possible.

In the era of Rabindra nath Tagore he was also criticized by the people in a bad way. Especially some literary magazines intentionally insulted

Rabindranath. Sometimes this was happened as they had different views but often out of pure jealousy. But Rabindranath never answered rudely, nor did he use slangs for answering. He was a very soft-spoken person, who always respected his family, its culture and the heritage of our society. In this essay, we are going to look at the slangs which were used by Tagore in his writings, and also the deep purpose to use the same.

Discussion

বাঙালির মননের উৎকর্ষ নির্ধারিত হয় রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চার দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির কাছে শুধু একজন কবি, একজন চিন্তাবিদ, একজন সংগঠক নন; তিনি বাঙালির চরিত্রের উদ্বোধক। রবীন্দ্র সাহিত্য বাঙালির কাছে সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায় বাঁচার রসদ। বাঙালি বলতে চায় রবীন্দ্রনাথের মতো করে, বাঙালি ভাবতে চায় রবীন্দ্রনাথের মতো করে। বাঙালির মন আর মানসিকতা, চিন্তা আর চেতনা সবই পরিপুষ্ট রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ধারায়।

জীবন থাকলে সেখানে রাগ, দ্বেষ, ঘৃণা, নিন্দা ইত্যাদি থাকবেই, আর তারই বহিঃপ্রকাশ হিসাবে মুখের ভাষায় চলে আসে নিন্দাসূচক শব্দ, অপভাষা, গালাগালি। চরিত্রের সজীবতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিপাদনের জন্যই বিশেষ কোন চরিত্রের মুখে কখনও কখনও ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিন্দাসূচক শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।

চরিত্রের অবস্থানগত কারণে, বাস্তবতার প্রয়োজনে সাহিত্যে অনেক সময়ই অপভাষার প্রয়োগ দেখি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের মধ্যেও তেমনিই বাস্তব ভিত্তির উপর চরিত্রকে দাঁড় করাতে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের মুখে অপভাষার বা নিন্দাসূচক ভাষার ব্যবহার করেছেন। এতে চরিত্র যে শুধুমাত্র বাস্তব সম্মত হয়েছে তাই নয়, লেখকের সমাজদৃষ্টির সূক্ষ্মতাও তেমনিই পরিস্ফুট হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই ‘রবীন্দ্র সাহিত্যে অপভাষার প্রয়োগ’ বললে আমরা বাঙালিরা নড়ে চড়ে বসি! সে কী! রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে অপভাষা? তাও আবার হয় না কি? হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মধ্যেও অপভাষার প্রয়োগ আছে; আর পূর্ববর্তী প্রশ্নের তৈরি হওয়া থেকেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সেই অপভাষার ব্যবহার এতখানি সার্থক, প্রাঞ্জল ও চরিত্রানুগ হয়েছে, যে সেই ব্যবহার সম্পর্কে আমরা আদৌ সচেতন থাকি না; অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রযুক্ত অপভাষার প্রয়োগ এতটাই চরিত্রের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে যে তা আলাদা করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *ঘরে-বাইরে*[১] উপন্যাসে নারীর প্রথম বাইরে আসাকে যেমন দেখিয়েছেন, তেমনই দেখিয়েছেন ঘর ও বাইরের দ্বন্দ্ব, ঘরের চার দেওয়ালের বাঁধন ছিঁড়ে যখন দেশের কাজের নামে সন্দীপের পানে ধেয়ে চলেছে বিমলা তখন তার মেজো জা সাধ্য মত বাধা দিতে চেষ্টা করেন। কখনও ননকু দারোয়ানকে দুই মহলের মাঝে বসিয়ে বিমলার পাহারার ব্যবস্থা করেন, কখনও থাকো ও ক্ষেমা নামের দাসীদের টিপে দিয়ে মিথ্যে ঝগড়া লাগিয়ে তাদের একজনকে পাঠিয়ে দেন বার মহলে বিচার চাইতে, ফলে বিমলাকে অন্দরে ফিরতেই হয়। ফিরে বিমলা জানতে চায় –

> “মেজোরানী, তোমার থাকো ক্ষেমাকে এমন মিছিমিছি গাল দেয় কেন?”
> “তিনি ভুরু তুলে আশ্চর্য হয়ে বললেন, ওমা, সত্যি নাকি? মাগীকে ঝাঁটা-পেটা করে দূর করে দেব।”[২]

এই যে ঝাঁটাপেটা করার প্রসঙ্গ এটি কর্ম বিষয়ক নিন্দাসূচক প্রয়োগ। এখানে কেউ অপভাষার প্রয়োগ করেছে, তাকে শাসন করতে যে কাজ করা হবে বলা হল তাও শালীন নয়। আর মেয়ে অর্থে ‘মাগী’ শব্দের প্রয়োগ তো সেযুগে নিত্যদিনের ঘটনা ছিল। ‘শাস্তি’[৩] গল্পে রামলোচন চক্রবর্তী রাধার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সন্ধ্যার সময় কুরিদের বাড়িতে এসে বলেছিলেন 'মাগীরা বুঝি ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে’[৪] বোঝা যায় সেযুগে নারী অর্থে ‘মাগী’ শব্দের প্রয়োগ স্বাভাবিক ছিল নারী, পুরুষ উভয়ের মুখেই।

গালি হল একধরনের শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যা মূলত কটূক্তি বা নিন্দাসূচক কথা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোনো ব্যক্তিকে নিন্দা করা, অপমান করা বা অভিসম্পাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে গালি ব্যবহৃত হয়। যখন পরস্পরের মধ্যে গালি

বিনিময় হয় তখন তাকে গালিগালাজ বলে। অপভাষা বলতে আমরা মূলত ইতর, অভদ্র ভাষা বুঝে থাকি।অন্যদিকে নিন্দা প্রকাশ করা হয় যে শব্দের দ্বারা তাকে নিন্দাসূচক শব্দ বলে।

সাধারণত দেখা যায় ছেলেদের মুখের ভাষায় অনায়াসেই চলে আসে অপভাষা ও নিন্দাসূচক শব্দ, বিচার করলে দেখা যাবে এগুলি অপেক্ষাকৃত 'হার্ড বা স্ট্রং' অপভাষা; কিন্তু সমাজ ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করা ব্যক্তি মাত্রেই জানেন মেয়েদের মুখের ভাষাতেও অনায়াসেই প্রযুক্ত হয় অপভাষা, এবং তাঁরা যে অপভাষার প্রয়োগ করছেন সে সম্পর্কেও তাঁরা সচেতন থাকেন না। 'আঁটকুড়ের বেটা', 'আবাগীর বেটি', 'ভাতারখাকি', 'হারামজাদী' প্রভৃতি শব্দ অতি অনায়াসেই উচ্চারিত হত আমাদের ঠিক দুই প্রজন্ম আগের নারীদের মুখে জীবনের দৈনন্দিনতায়। সেই যুগে বিদ্যালয়ের শিক্ষা বঞ্চিত নারীদের জগৎ ছিল সংকীর্ণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি মাত্র পুরুষের মুখাপেক্ষী জীবনে স্বার্থে ঘা লাগলেই তারা মুখে তুলে নিতেন নিন্দাসূচক শব্দ ও অপভাষা। বর্তমান প্রজন্মের নারী ও পুরুষের মুখের অপভাষা অনেক ক্ষেত্রেই কাছাকাছি চলে এসেছে, শিক্ষায়, কর্মে, রুচিতে মিলের কারণে ভাষা ব্যবহারের দুস্তর ব্যবধানও ক্রমে কমে আসছে সেকথা অনস্বীকার্য।

যুগ বদলায় পুরনো যুগ নতুন যুগেকে সহ্য করতে পারে না, নতুন যুগ পুরাতনকে স্বীকার করতে চায় না; তখন কলহ, সংঘাত বাধে, এই সময় যে নিন্দাসূচক শব্দ প্রযুক্ত হয় তা মূলত সময়কে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথের *ব্যঙ্গকৌতুকের* 'গুরুবাক্য'[৫] নাটকে পাই খগেন্দ্র জটায়ুর মৃত্যু অস্ত্রের আঘাতে হয়েছে বলায় গুরু শিরোমণিমশাই বলেন, "আধুনিক নব্যতন্ত্র কালেজের ছেলের মতোই উত্তর হয়েছে।"[৬] এখানে 'কালেজের ছেলে' নিন্দার্থে প্রযুক্ত। এই নিন্দা যুগ জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। 'সমাপ্তি'[৭] গল্পে মেয়েদের শাশুড়ির কাছে শাসিত হওয়ার প্রসঙ্গ এসেছে, অপূর্বর মা মৃন্ময়ীকে বলেছেন –

> "দেখো বাছা, তুমি কিছু আর কচি খুকি নও, আমাদের ঘরে অমন বেহায়াপনা করিলে চলিবে না।"[৮]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসের একেবারে শেষে যখন চন্দ্রনাথ বাবু এসে জানান হরিশ কুন্ডুর কাছারি লুট হয়ে গেছে এবং মুসলমানরা ক্ষেপে উঠে মেয়েদের ওপর ভয়ানক অত্যাচার করছে তখন নিখিলেশ বেরিয়ে যেতে চায় তাদের রক্ষা করতে এবং বিমলার বাধাও সে মানেনা। নিখিলেশ ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলে মেজ রানী অত্যন্ত চটে উঠে বিমলাকে গাল দিয়ে বলেন - "রাক্ষুসী, সর্বনাশী। নিজে মরলি নে, ঠাকুরপোকে মরতে পাঠালি?"[৯] নিজ স্বার্থে আঘাত লাগলে মানুষের মুখের ভাষা যে সৌজন্যের আবরণ মানে না এখানেই আমরা তার প্রমাণ পাই।

অপভাষা প্রয়োগের অনেক ধরন থাকতে পারে, যেমন বন্ধুর প্রতি প্রযুক্ত অপভাষা, এর আবার দুটি ধরন – আদর বা প্রশ্রয় মিশ্রিত এবং রাগ বা দ্বেষ মিশ্রিত; শত্রুর প্রতি প্রযুক্ত অপভাষা, ভিন্ন লিঙ্গের প্রতি প্রযুক্ত অপভাষা, লিঙ্গ ভেদে প্রচলিত অপভাষা, ভিন্ন জাতির প্রতি প্রযুক্ত অপভাষা, ভিন্ন ধর্মের প্রতি প্রযুক্ত অপভাষা।এই সবেরই উদাহরণ আছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। বন্ধু বা বন্ধু ভাবাপন্ন মানুষদের মধ্যে প্রচলিত অপভাষার ব্যবহার দেখি *চিরকুমার সভা*[১০] নাটকে। জামাইবাবু অক্ষয় তাঁর অন্য শালীদের বিয়ের জন্য তাঁর শাশুড়িমা ক্ষেপে উঠেছেন শুনে বিধবা শ্যালীকে অন্য শালীর প্রসঙ্গে বলেন, "ওকে ঐজন্যেই তো বর্বরা নাম দিয়েছি। অয়ি বর্বরে, ভগবান তোমাদের কটি সহোদরাকে এই একটি অক্ষয় বর দিয়ে রেখেছেন, তবু তৃপ্তি নেই?"[১১] বোঝা যায়, বন্ধু ভাবাপন্ন মানুষদের প্রতি প্রযুক্ত এই অপভাষার প্রয়োগে মিশে আছে অনেকখানি আদর ও প্রশ্রয়। আবার দুই বন্ধুর মধ্যে যখন মতবিরোধ হয় তখন সেখানেও অনেক ক্ষেত্রেই অপভাষা বা নিন্দাসূচক শব্দ প্রযুক্ত হতে আমরা দেখি। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গোরা*[১২] উপন্যাসে যখন বিনয় ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী সুচরিতাদের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করছে এবং তাদের সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে এবং সেখান থেকে সুচরিতাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসছে, তখন তা দেখে গোরা ক্রোধান্বিত হয়েছে এবং মনে মনে বিনয়কে বলেছে, "মূঢ়! নাগপাশে এমনি করিয়াই ধরা দিতে হয়! এত সত্বর! এত সহজে!"[১৩] এখানে 'মূঢ়' শব্দে কিন্তু গোরার সেই মুহূর্তের প্রচণ্ড রাগ প্রকাশিত হয়েছে।

মানুষ যখন নিজের স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয় তখন বন্ধুও শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, বাপ বেটাতেও ঝগড়া লাগে। রবীন্দ্রনাথের সম্পত্তি সমর্পণ[১৪] গল্পে এর উদাহরণ আছে, যজ্ঞনাথের অতিরিক্ত কৃপণতার কারণে যখন জীবন নির্বাহ করা কঠিন হয়ে উঠেছে তখন বাপ যজ্ঞনাথের সঙ্গে ছেলে বৃন্দাবনের মতান্তর ঘটে - "এ সম্বন্ধে পিতাপুত্রে প্রায় বচসা হইতে

লাগিল।”[১৫] যজ্ঞনাথ বৃন্দাবনের কথা না শোনায় “বৃন্দাবন প্রথমে পায়ে ধরিল, তার পরে রাগারাগি করিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না। পত্নীর মৃত্যু হইলে বাপকে স্ত্রীহত্যাকারী বলিয়া গালি দিল।”[১৬] এরপরই বৃন্দাবন পৃথক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যা মানতে পারেন না যজ্ঞনাথ। ‘বাপ যজ্ঞনাথ কুণ্ড বলিলেন, “বেটা অকৃতজ্ঞ, তোকে ছোট বেলা থেকে খাওয়াইতে পরাইতে যে খরচ হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিবার চেষ্টা নাই, আবার তেজ দেখো না!”[১৭] এইভাবে পিতাপুত্রের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, যজ্ঞনাথ বললেন বৃন্দাবনকে ধন দেওয়া গোরক্তপাতের সঙ্গে গণ্য হবে, বৃন্দাবনও বলে গেল যজ্ঞনাথের ধন নিলে তা মাতৃরক্তপাতের তুল্য পাতক হবে।

ভিন্ন লিঙ্গের প্রতি প্রযুক্ত অপভাষার প্রয়োগ দেখি *চিরকুমার সভা* [১৮] নাটকে এবং ‘রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা’[১৯] গল্পে। নাটকের প্রসঙ্গ পূর্বে আলোচিত হয়েছে। সেখানে শালীকে ‘বর্বরে’ সম্বোধনে ছিল প্রশ্রয়। ভিন্ন লিঙ্গের প্রতি প্রযুক্ত অপভাষায় তীব্র আঘাত করার প্রবণতাও থাকে, যেমনটা পাই রবীন্দ্রনাথের *যোগাযোগ*[২০] উপন্যাসে, সেখানে বিধবা ভাই-বৌ শ্যামাসুন্দরী মধুসূদনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লে, এবং পরে কলহ করলে মধুসূদন তাকে বলেছে, “দূর হয়ে যা বজ্জাত, আমার বাড়ি থেকে।”[২১] ‘রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা’[২২] গল্পে পাই, “অবশেষে নালিশ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া জাতিতে গিয়া পৌঁছিল - নবদ্বীপের মা পুরুষের ভালোবাসার সহিত মুসলমানের মুরগি-বাৎসল্যের তুলনা করিলেন। নবদ্বীপের বাপ বলিলেন, "রমণীর মুখে মধু, হৃদয়ে ক্ষুর"- যদিও এই মৌখিক মধুরতার পরিচয় নবদ্বীপের বাপ কবে পাইলেন, বলা শক্ত।”[২৩]

ভিন্ন জাতির প্রতি প্রযুক্ত অপভাষার উদাহরণ পাই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও *য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরিতে* ।[২৪] ‘দুই বিঘা জমি’[২৫] কবিতায় পাই – “ঝুঁটি বাঁধা উড়ে, সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।”[২৬] বাঙালির মুখে, ‘উড়ে’, ‘খোট্টা’, ‘মেড়ো’ প্রভৃতি শব্দ নিন্দাসূচক অর্থেই প্রযুক্ত হয়। প্রাদেশিকতার কারণে নিজেদের ‘স্যুপিরিয়র’ মনে করার জন্যই বাঙালি এই সব শব্দ ব্যবহার করে। আবার ‘ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স’ও যে তাদের মধ্যে কম নেই, তা ধরা পড়ে রবীন্দ্রনাথের *য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে* [২৭], সেখানে তিনি একটি ইঙ্গ বঙ্গ জাতীয় সংগীতের নমুনা দিয়েছেন -

“মা, এবার মলে সাহেব হব;
রাঙা চুলে হ্যাট বসিয়ে, পোড়া নেটিব নাম ঘোচাব।
সাদা হাতে হাত দিয়ে মা, বাগানে বেড়াতে যাব।
(আবার) কালো বদন দেখলে পরে ডার্কি বলে মুখ ফেরাব।”[২৮]

বোঝাই যায় ইঙ্গ-বঙ্গদের মুখের স্বজাতির নিন্দা বোঝাতেই তিনি এই জাতিবাচক ‘নেটিভ’, ‘ব্ল্যাকি’ প্রভৃতি নিন্দাসূচক শব্দ তুলে এনেছেন।

ভিন্ন ধর্মের প্রতি প্রযুক্ত অপভাষার উদাহরণ ‘বিধর্মী’, ‘ম্লেচ্ছ’, ‘কাফের’ ইত্যাদি শব্দ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘দুরাশা’[২৯] গল্পের যবন কন্যা, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পালনকারিণীর কাহিনীতে এই ‘ম্লেচ্ছ’, ‘বিধর্মী’ দুই শব্দই পেয়েছি। বদ্রাউনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর কন্যা, সিপাহি বিদ্রোহ দমনের প্রচণ্ড সময়ে তার ভাইয়ের পরিচ্ছদ পরিধান করে ছদ্মবেশে কেল্লা থেকে বেরিয়ে আসে, কারণ তার জবানীতে পাই – “বিশ্বাসঘাতক পিতার গৃহ আমার নিকট নরকের মতো বোধ হইল।”[৩০] সারা রাত খুঁজে তার প্রণয়ী ও ইষ্ট কেশরলালকে সে আবিষ্কার করে যমুনাপুলিনে, নবাবকন্যা তাকে মৃত বলেই মনে করেছিল, কিন্তু নবাব কন্যার ভক্তিনম্র প্রণামের স্পর্শে চেতনা ফিরে পেয়ে কেশরলাল জল চায়, নবাব কন্যা আপন বস্ত্র ভিজিয়ে জল এনে তাকে সুস্থ করলে কেশরলাল পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, ও নবাবপুত্রীর পরিচয় পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বলে, ‘বেইমানের কন্যা, বিধর্মী! মৃত্যুকালে যবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম নষ্ট করিলি।’[৩১] এই গল্পের শেষে নবাবকন্যা দীর্ঘ সাধনায় যখন নিজেকে ব্রাহ্মণত্বে উত্তীর্ণ বলে মনে করেছে তখন সে ভুটিয়া, লেপচাদের হিন্দুত্বহীনতা সম্পর্কে বলেছে, -

> “এ হিন্দুর দেশ নহে- ভুটিয়া লেপ্‌চাগণ ম্লেচ্ছ, ইহাদের আহারব্যবহারে আচারবিচার নাই, ইহাদের দেবতা ইহাদের পূজার্চনাবিধি সকলই স্বতন্ত্র।”[৩২]

অবশেষে জীবনের দীর্ঘ আটত্রিশ বছর পার করে নবাবকন্যা কেশরলালের দেখা পায় ভুটিয়া বস্তিতে। এতদিন এই নবাবকন্যা যাকে ধর্ম বলে জেনেছে, তা একটা নিতান্ত অভ্যাস বা সংস্কার মাত্র জেনে আজ তার কাছে 'বিধর্মী', 'ম্লেচ্ছ' এই সব কোন নিন্দাবাচক শব্দেরই আর কোন অর্থ নেই।

রবীন্দ্র সাহিত্যে অপভাষা ও নিন্দাসূচক শব্দের প্রয়োগের উদাহরণ পাচ্ছি কবিতায়, যেমন 'পুরাতন ভৃত্য'[৩৩] কবিতায় দেখি-

"ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর।
যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন কেষ্টা বেটাই চোর।"[৩৪]

এখানে চেহারা নিয়ে খোঁটার সঙ্গে সঙ্গেই পেলাম 'নির্বোধ', 'চোর' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার। রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট'[৩৫] গল্পেও আমরা 'নির্বোধ' শব্দটি পেয়েছি। রাজধর তাঁদের অস্ত্র শিক্ষক ইশা খাঁ-কে নিষেধ করে তার নাম ধরে ডাকতে, ইশা খাঁ এতে রেগে যান এবং মেজো রাজপুত্র ইন্দ্রকুমারও রাজধরকে নিয়ে হাসাহাসি করে। তখন রাজধর অধীর হইয়া বলিলেন, "দাদা, তুমি নিতান্ত নির্বোধ।"(মুকুট) [৩৬]

'দুই বিঘা জমি'[৩৭] কবিতায় পাই -

"ধিক ধিক ওরে শত ধিক তোরে
নিলাজ কুলটা ভূমি
যখন যাহার তখনই তাহার এই কি জননী তুমি?"[৩৮]

'নিলাজ' অর্থ নির্লজ্জ আর 'কুলটা' শব্দে আমরা কুলত্যাগকারিণী, ভ্রষ্টা রমণীকে বুঝি। কেবলমাত্র 'কুলটা' নয় বড়লোকের সেবাদাসীতে পরিণত হওয়ায় উপেন এখানে জন্মভিটেকে 'রাক্ষসী' বলতেও পিছপা হয় নি। জন্মভিটের প্রতি তার সবচেয়ে বড় আফশোস - 'ছিলে দেবী হলে দাসী।'[৩৯] আসলে জন্ম ভিটের আঁচলহারা হয়ে উপেন তখন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছে। সে পথে পথে বিবাগী হয়ে ঘুরছে, অথচ তার জন্মভূমি মা, বড়লোকদের আদরে বিলাসী বেশ ধরেছে এ তার পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত। কিছু পূর্বে সে যে বঙ্গভূমিকে দেখেই "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"[৪০] এই কথাই 'নমো নমো নমো সুন্দরী মম'[৪১] মন্ত্রে উল্লেখ করে জন্মভূমিকে বন্দনা জানিয়েছে, নিজস্ব ভূমিখণ্ডটুকুর বিলাসী বেশ দেখে, তা আর তখন তার মনে নেই। এরপরই দেখি জন্মভিটের আমগাছের আম কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য সে 'চোর' অপবাদে ধৃত হচ্ছে লাঠি গাছ হাতে করা 'উড়ে' মালীর হাতে। মালীর মুখে বিবরণ শুনে রাজা রেগে যান,

"শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন "মারিয়া করিব খুন!
বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ।"[৪২]

এরপর উপেন নিজের জবানীতে জানিয়েছে, -

"আমি কহিলাম শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়!
বাবু কহে হেসে, "বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।"[৪৩]

এরপরই উপেন আঁখি জলে ভেসে ভাবতে বাধ্য হয়েছে –

"তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!"[৪৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গিন্নি'[৪৫] গল্পে শিবনাথ পণ্ডিতের বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা ছাত্র মনস্তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছি, শিবনাথ পণ্ডিতের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংগতি রেখে তাঁর প্রতি বর্ষিত ছাত্রের বিশেষণও যোগ্যই হয়েছে বলতে হবে! শিবনাথ পণ্ডিত "মাঝে মাঝে হুংকার দিয়া উঠিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে এত ইতর কথা মিশ্রিত থাকিত যে তাহাকে দেবতার বজ্রনাদের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 772 - 787
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রূপান্তর বলিয়া কাহারো ভ্রম হইতে পারে না। বাপান্ত যদি বজ্রনাদ সাজিয়া তর্জনগর্জন করে, তাহার ক্ষুদ্র বাঙালিমূর্তি কি ধরা পড়ে না।”[৪৬] সেই জন্য ছাত্রদের প্রীতি প্রাপ্তি ঘটে নি শিবনাথের ভাগ্যে।

> “যাহা হউক, আমাদের স্কুলের এই তৃতীয়শ্রেণী দ্বিতীয়বিভাগের দেবতাটিকে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ অথবা কার্তিক বলিয়া কাহারো ভ্রম হইত না; কেবল একটি দেবতার সহিত তাঁহার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যাইত, তাঁহার নাম যম এবং এতদিন পরে স্বীকার করিতে দোষ নাই এবং ভয়ও নাই, আমরা মনে মনে কামনা করিতাম, উক্ত দেবালয়ে গমন করিতে তিনি যেন আর অধিক বিলম্ব না করেন।”[৪৭]

ছাত্রদের বাপান্ত করলে ছাত্ররা যম ছাড়া মাস্টারমশাইকে আর কী-ই বা ভাবতে পারে?
‘রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা’[৪৮] গল্পে আমরা নিন্দাসূচক শব্দ ও অপভাষার প্রয়োগ পেয়েছি বেশ বেশি পরিমাণে –

> “যদিও দুই ভাইয়ে পৃথগন্ন ছিলেন, তথাপি এই আশায় নবদ্বীপের মা নবদ্বীপকে কিছুতেই চাকরি করিতে দেন নাই- এবং সকাল-সকাল বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া বিবাহ নিষ্ফল হয় নাই।”[৪৯]

রামকানাইয়ের দাদার মৃত্যুর পর দাদার গিন্নির কান্নাকে বিষয় বঞ্চিতরা বলেছে – ‘মায়াকান্না’[৫০]। ছেলে নবদ্বীপ তার জ্যাঠার বিষয় পায় নি।

“উইলের বৃত্তান্ত শুনিয়া নবদ্বীপের মা ছুটিয়া আসিয়া বিষম গোল বাধাইয়া দিল- বলিল, ‘মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়।’ তিনি থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, “মেজোবউ, তোমার তো বুদ্ধিনাশের সময় হয় নাই, তবে তোমার এমন ব্যবহার কেন।”[৫১] মৃত জ্যাঠামশাই সম্পর্কে নবদ্বীপের মনে কোন অনুভূতির জন্ম হয় না - “নবদ্বীপ একটা সান্ত্বনা পাইল যে, লোকটা পরকালে গিয়া মরিয়া থাকিবে।”[৫২] জীবিত কালে সম্পর্ক যেমনই থাকুক না কেন, মৃত মানুষ সম্পর্কে নবদ্বীপের ভাবনা যে যথোচিত নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নবদ্বীপের মা এরপর নবদ্বীপের বাপকে নিয়ে পড়েন –

> “তুমিও সময়কালে ঐ কীর্তি করবে বলে বসে আছ। আমি মলেই কোন্ পোড়ামুখী ডাইনীকে ঘরে আনবে-- আর আমার সোনার-চাঁদ নবদ্বীপকে পাথারে ভাসাবে।”[৫৩]

এরপর নবদ্বীপ তার বাবা যাতে সব ভণ্ডুল করতে না পারেন তাই তাঁকে বাড়ি ছাড়া করতে বলে,

> “অবশেষে মার তাড়নায় এই নিতান্ত অনাবশ্যক নির্বোধ কর্মনাশা বাবা একটা যেমন-তেমন ছল করিয়া কিছুদিনের মতো কাশীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।”[৫৪]

নবদ্বীপের মার মৃত্যুর পর তার বাবা যে কোনও হাড়জ্বালানী ডাকিনী কিংবা ‘পোড়ারমুখী ডাইনী’[৫৫] - কে এনে হাজির করবে, সে বিষয়ে নবদ্বীপের মা নিশ্চিত ছিলেন। বাবা কাশী গেলে, নবদ্বীপ জাল উইল তৈরি করে। নবদ্বীপের বাপ ফিরে এসে সব জেনে প্রতিবাদ করলে, “গৃহিণী ক্রমে নিজমূর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, ‘কেন, এতে নবদ্বীপের দোষ হয়েছে কী। সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না! অমনি এক কথায় ছেড়ে দেবে!”[৫৬] তিনি আরও যোগ করলেন, “কোথা হইতে এক চক্ষুখাদিকা, ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী, অষ্টকুষ্ঠীর পুত্রী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবে, ইহা কোন্ সৎকুলপ্রদীপ কনকচন্দ্র সন্তান সহ্য করিতে পারে। যদি-বা মরণকালে এবং ডাকিনীর মন্ত্রগুণে কোনো-এক মূঢ়মতি জ্যেষ্ঠতাতের বুদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে, তবে সুবর্ণময় ভ্রাতুষ্পুত্র সে ভ্রম নিজহস্তে সংশোধন করিয়া লইলে এমন কী অন্যায় কার্য হয়!”[৫৭] অবশেষে অন্ন-জল ত্যাগ করেও বোঝাতে না পেরে রামকানাই শেষ পর্যন্ত আদালতে তার সদ্য বিধবা বৌদির পক্ষে সাক্ষ্য দেন এবং তাতে নবদ্বীপের পক্ষের সকলে মনে করে - “এমনতরো আস্ত নির্বোধ সমস্ত শহর খুঁজিলে মিলে না।”[৫৮] শেষে পুত্রের নাম উচ্চারণ করতে করতে “এই নির্বোধ সর্বকর্মপণ্ডকারী নবদ্বীপের অনাবশ্যক বাপ”[৫৯] পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। এখানে আমরা ‘চক্ষুখাদিকা’, ‘ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী’, ‘অষ্টকুষ্ঠীরপুত্রী’ ইত্যাদি তৎসম অপভাষার প্রয়োগ পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে, বলা বাহুল্য বাঙালির মুখের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 772 - 787
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভাষায় ইংরেজ শাসনকালে এই গালিগুলির কথ্যরূপই ব্যবহৃত হত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম শুচিতার আদর্শবোধের জায়গা থেকে, পারিবারিক রুচিশীলতার কারণে, সর্বোপরি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের গুরুদেব হিসেবে ও নিজস্ব নৈতিক মূল্যবোধ ও সৌন্দর্যচেতনার জন্য ঐ অমার্জিত, অপরিশীলিত ভাষাকে তৎসমে রূপান্তরিত করে ব্যবহার করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'[৬০] গল্পে এই প্রয়োগ এক আলাদা শ্লেষাত্মক হাস্যরসের জন্ম দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পে মৃন্ময়ীর প্রসঙ্গে 'অস্থিদাহকারী দস্যু-মেয়েকে'[৬১] রাখতে অপূর্বর মা রাজি হচ্ছেন না। 'হাড়জ্বালানে' না বলে এই অস্থিদাহকারী বলাও এক প্রকার সাধু প্রয়োগ। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রাহক, ছেলেভুলানো ছড়ার তখনও কিন্তু তিনি এই কাজ করেছেন, 'ভাতারখাকি' শব্দটিকে তিনি 'স্বামীখাকি' শব্দে বদলে দিয়েছেন -

> "বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুড়া ধরে।
> সেই যে বোন গালি দিয়েছেন স্বামীখাকি বলে।"[৬২]

এখানে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত মুখের ভাষাকে ছড়া সংগ্রহের কালে বদলে দেওয়ায় তাত্ত্বিক গবেষকদের বিচারে রবীন্দ্রনাথ সমালোচিতও হয়েছেন, কারণ 'স্বামীখাকি' ও 'ভাতারখাকি' একই অর্থ বহন করলেও তা মূলগতভাবে শ্রেণিচরিত্রের এক বদল ঘটিয়ে ফেলে অনায়াসেই। তবুও রবীন্দ্রনাথ পারেন না, নিজস্ব অবস্থান থেকেই পারেন না, যেমনটি পেয়েছেন তেমনটিই ছেপে দিতে, কোথাও তাঁর রুচিতে বাঁধে, মর্যাদায় বাঁধে।

চিরকুমার সভা[৬৩]য় দেখি অক্ষয় তার শালীরা বই পড়ছে এতে সন্তুষ্ট নয়, সে বলছে, "ঐ তো! বই পড়ে পড়ে চোখ কানা করলে-"[৬৪] 'কানা' কথাটি অবশ্যই অশিষ্ট প্রয়োগ। কানাকে কানা খোড়াকে খোঁড়া বলা যেমন অন্যায় তেমনি কোন বৃদ্ধকে 'বুঢ়া' নামে ডাকা অবশ্যই নিন্দা সূচক প্রয়োগ, কিন্তু কথার ধরনে যদি আদর মেশানো থাকে তাহলে তা আর নিন্দাসূচক থাকে না, একথাই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন তাঁর 'দালিয়া'[৬৫] ছোট গল্পে। বৃদ্ধ ধীবরের গৃহে পালিত আমিনা ধীবরকে 'বুঢ়া' নামেই ডাকতো। "বুঢ়া আজ আমার দিদি আসিয়াছেন। তাই আজ ছুটি।"[৬৬] অথবা "ভাবনা নাই বুঢ়া আজ আমি তাহার (দালিয়ার) কাছ হইতে দুই থলু আদায় করিয়া দিব, একটিও মাছ দিতে হইবে না।"[৬৭] এখানে এই 'বুঢ়া' সম্বোধন নিন্দাসূচক হলেও আমরা বুঝতে পারি আমিনার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন স্নেহ এবং ভালোবাসা তাতে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে। "না, তুমি অতি বর্বর। শাহজাদির সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্য নহ। তোমাকে সহবত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।"[৬৮] শুধু এখানেই শেষ নয়,আমিনা তার দিদি জুলিখাকে বলে, "দিদি রাগ করিস না ভাই। এখানকার মানুষগুলো এইরকমের। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেছে।"[৬৯] কিন্তু তার কথার ধরন থেকে জুলেখার বুঝতে বাকি থাকে না এই 'হাড় জ্বালাতন' সে বড় আনন্দে ও আদরে সহ্য করছে। 'সমাপ্তি'[৭০] গল্পে পাই, "পাগলি মৃন্ময়ীকে অনেকেই ভালোবাসিত"[৭১] – 'পাগলি' নিন্দাসূচক শব্দ হলেও এখানে প্রশ্রয় মিশ্রিত ছিল।

একইভাবে 'লক্ষ্মীছাড়া' শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে বলা যায়। যখন মা বা বাবা সন্তানকে 'লক্ষ্মীছাড়া' বলেন তখন তার মধ্যে অনেকখানি স্নেহ ও প্রশ্রয় মিশে থাকে। আবার কখনো এই 'লক্ষ্মীছাড়া' শব্দই নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে শব্দ এখানে বড় কথা নয়, কোন্ ধ্বনিতে তা উচ্চারিত হচ্ছে সেটিই বড় কথা। মা বা বাবার মুখে সন্তান সম্পর্কে যখন 'লক্ষ্মীছাড়া' শব্দের প্রয়োগ পাই, তার মধ্যে মিশে থাকে কখনও আদর, কখনও প্রশ্রয় আবার কখনও অভিমান। মানুষ নিজের সম্পর্কে যখন ঐ একই শব্দ প্রয়োগ করে তখন তার অর্থ কতখানিই না বদলে যায়! 'লক্ষ্মী-ছাড়া'র অর্থ লক্ষ্মী যাকে ত্যাগ করেছেন এমন; দুষ্ট, পাজী, দুর্ভাগা। রবীন্দ্রনাথের 'রোগের চিকিৎসা'[৭২] হাস্যকৌতুকে হারানচন্দ্রের বাবা হারাকে বলেন, "লক্ষ্মীছাড়া, তোর কি কিছুতেই চৈতন্য হবে না?"[৭৩] হাস্যকৌতুকের 'ছাত্রের পরীক্ষা'[৭৪]-য় মাস্টার হারানচন্দ্র ছাত্র মধুসূদনকে বলেন, "লক্ষ্মীছাড়া, মেরে তোমার পিঠ লাল করব, তবে তুমি সিধে হবে!"[৭৫] এখানে পরের ছেলেকে প্রহারের যে ঐকান্তিক আগ্রহ মাস্টারের মধ্যে প্রকাশিত, তা নিশ্চয়ই হারার বাপের কাছ থেকে আশা করা যায় না। অন্য দিকে 'দুই বিঘা জমি'[৭৬] কবিতায় যখন জমিদারবাবু উপেনকে তার শেষ সম্বল দুই বিঘা জমির ভিটে মাটি ছেড়ে দিতে বলেন, তখন উপেন বলে, "দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনই লক্ষ্মীছাড়া?" (৭৭) এখানে উপেনের সব হারানোর আশঙ্কা ও হতাশা নিবিড় বেদনায় প্রকাশিত। এই দুই প্রয়োগ থেকেই বোঝা যায়, নিন্দাসূচক শব্দ প্রয়োগের অর্থ সব সময় এক নয়; কেবল

মাত্র শব্দটি নয়, তাকে প্রকাশ করার ক্ষেত্র ও পরিস্থিতি অর্থের বদল ঘটায়, এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলার ধরন, কথার সুর, স্বরের ওঠা নামা। তেমনিই 'হতভাগ্য', 'হতভাগা' শব্দে বুঝি মন্দভাগ্য, দুর্ভাগা। 'রোগীর চিকিৎসা'[৭৮] হাস্যকৌতুকে হাঁস চুরি করা হারু সম্পর্কে যখন বলা হয়, "সব বোঝা গেছে। হতভাগাকে জব্দ করতে হবে।"[৭৯] তখন সেই দুষ্ট বালকের চিকিৎসার প্রয়োজন যেমন সুস্পষ্ট *চিরকুমার সভা* নাটকে কিন্তু 'হতভাগ্য' শব্দ সেই অনুভূতি আনছে না। অক্ষয় যখন তার স্ত্রীকে বলে, "যেখান থেকে এই হতভাগ্যকে তোমার গোষ্ঠে ভর্তি করেছ। আমাদের সেই চিরকুমার-সভা।"[৮০] এখানে 'হতভাগ্য' শব্দে কিন্তু সৌভাগ্যবান রূপেই নিজেকে সূচিত করতে চাইছে অক্ষয়, আর সংসারকে সে যতই 'গোষ্ঠ' বলুক আসলে স্ত্রীর প্রেমরজ্জু তার কাছে চরম অভীপ্সিত তা বুঝতে পাঠকের বাকি থাকে না। *চিরকুমার সভা* [৮১] - তে শ্লেষাত্মক কথা অনেক ক্ষেত্রেই হাস্যরস সৃজন করেছে। অক্ষয় শালীদের বিয়ের কথা শুনে বলে, "ওরে বাস রে। একেবারে বিয়ের এপিডেমিক। প্লেগের মতো।"[৮২] বড় শ্যালিকা ছোট দুই বোনের বিয়ের খবর আনলে বলে, "বল কী। শুভকর্ম! দুই শ্যালীর উদ্‌বাহবন্ধন!"[৮৩] বিয়েকে 'উদ্‌বাহবন্ধন' বলা, গৃহকে 'গোষ্ঠ' বলা, কিংবা বিয়ে প্রসঙ্গে 'এপিডেমিক' শব্দের প্রয়োগ নিশ্চয়ই শিষ্ট প্রয়োগ নয়, নিন্দাসূচক প্রয়োগ; কিন্তু বলার মজার ধরনটিই এক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য। *চিরকুমার সভা* [৮৪] -তেই দেখি বন্ধু ভাবাপন্ন মানুষদের পরস্পর সম্ভাসনে নিন্দাসূচক শব্দের প্রয়োগের দৃষ্টান্ত। অক্ষয় রসিককে ডাকে "ওরে পাষণ্ড, ভণ্ড, অকালকুষ্মাণ্ড।"[৮৫] রসিক ফিরে উত্তর করে, "কেন হে মত্তমন্থর কুঞ্জকুঞ্জর পুঞ্জঅঞ্জনবর্ণ।"[৮৬] কালো এবং মোটা বলে হাতির সঙ্গে তুলনা নিশ্চয়ই শিষ্টতা নয়! রসিকের প্রতি অতঃপর অক্ষয়ের জিজ্ঞাসা, "তুমি আমার শ্যালী-পুষ্পবনে দাবানল আনতে চাও?"[৮৭] 'কাবুলিওয়ালা'[৮৮] গল্পে রহমত কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত 'হামি সসুরকে মারবে।'[৮৯]

শ্বশুরের প্রতি মারবে শব্দের প্রয়োগ অবশ্যই শিষ্ট প্রয়োগ নয়, কিন্তু নাবালিকা মিনি ও তার কাছে বাঙলা ভাষার শিক্ষা নবিস কাবুলিওয়ালার মুখে এই কথা শুনে মনে হতেই পারে, 'অমৃত বালভাসিতং'[৯০]। আসলে কাবুলিওয়ালা বয়সে বড় হলেও মিনির সঙ্গে সহজে মিশে যেতে পারার কারণে আমরা যেন তাকে বালখিল্য রূপেই বিচার করি।

'রামকানাইয়ে নির্বুদ্ধিতা'[৯১] গল্পে যেমন আমরা 'গৃহ-পোষ্য' কথাটিকে নিন্দাসূচক হিসেবে পেয়েছি একইভাবে 'মধ্যবর্তিনী' (৯২) গল্পে আমরা দেখি 'পোষা পুরুষ' কথাটি নিন্দার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিবারণের বড় বউ হরসুন্দরীর ভাবনা হিসেবে সেখানে বলা হয়েছে –

> "বুঝিল, নববধূ পূর্বরাত্রে তাহার এই হতবুদ্ধি পোষা পুরুষটিকে অত্যন্ত ঝংকার দিয়া বলিয়াছিল, 'দিদির সিন্দুক ভরা গহনা, আর আমি বুঝি একখানি পরিতে পারি না।"[৯৩]

এই গল্পেই শৈলবালার মৃত্যুর পর হঠাৎ তার স্বামী নিবারণ আবিষ্কার করে-

> "এই কি তাহার আদরের শৈলবালা। হঠাৎ নিঃশ্বাস টানিয়া দেখিল, না, সে তাহার উদ্বন্ধনরজ্জু।"[৯৪]

এখানে 'উদ্বন্ধনরজ্জু' এই নিন্দাসূচক শব্দ প্রযুক্ত হচ্ছে ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কে নয়, সম্পর্কের গভীরতার অভাব প্রসঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহ পর্বের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য গল্প 'শাস্তি'[৯৫]। এই গল্পের অবিস্মরণীয় চরিত্র রামলোচন চক্রবর্তীর মুখে আমরা অপভাষার প্রয়োগ লক্ষ করি। প্রথমে ছিদামকে, তার বৌকে বাঁচানোর পরামর্শ দিলেও তিনি হাকিমের সামনে বলেন, "খবরদার হারামজাদা, আদালতে একবর্ণও মিথ্যা বলিস না- এতবড়ো মহাপাপ আর নাই।"[৯৬] ইসলাম ধর্মের বিধানমতে নিষিদ্ধ বা অবৈধ এমন বাচ্চাকে বোঝাতে 'হারামজাদা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এটি গালিবিশেষ। 'শাস্তি'[৯৭] গল্পে রামলোচন চক্রবর্তী জজ সাহেবের সামনে প্রত্যক্ষত ছিদাম সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে 'হারামজাদা' শব্দ প্রয়োগ করেন। ছিদাম চরিত্রকে বর্ণগত ও সামাজিক অবস্থানগত কারণে নিচু নজরে দেখেন বলেই চক্রবর্তীর এহেন উক্তি। নিজেকে ভালো প্রমাণ করার জন্য এবং জজসাহেবের সামনে পূর্বকৃত মিথ্যা সাক্ষ্যদানের প্ররোচনা দেওয়ার প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার জন্যই যেন রামলোচন এত তৎপর হয়ে উঠে বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে চান নিজের মত করে, তখনই তিনি বলেন 'হারামজাদা' শব্দটি।

'চতুরঙ্গ'[৯৮] উপন্যাসে আমরা 'পাজি', 'পাপিষ্ঠ', 'নচ্ছার', 'পাষণ্ড', 'পাগলা' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ পেয়েছি। শচীশের জ্যাঠামশাই ননির সর্বনাশ হওয়ার পর তার ভাই ননিকে নিতে এলে তাকে বলেন,

> "পাষণ্ড, লজ্জা নাই তোমার? ননিকে রক্ষা করিবার বেলা তুমি কেহ নও, আর সর্বনাশ করিবার বেলা তুমি ননির ভাই?"[৯৯]

এই উপন্যাসের অন্যত্র পাই, অভদ্র লোক শব্দের ব্যবহার। আবার ননীকে বিদায় করার পরামর্শ দিতে এলে দূরসম্পর্কের পিসিকে জগমোহন বলেন,

> "কিন্তু পাপ যদি বিদায় করি তবে এই পাপিষ্ঠের গতি কী হইবে?"[১০০]

উপন্যাসে শ্রীবিলাস তার রক্ষণশীল মনোভঙ্গীর উন্মোচন প্রসঙ্গে বলেছে, "আমাদের নিষ্ঠাবান কায়স্থের ঘর - জাতি হিসেবে সোনার-বেনেকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিয়া থাকি। আর, নাস্তিককে নর ঘাতকের চেয়ে, এমন-কি গো-খাদকের চেয়েও পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিতাম।"[১০১] জগমোহন শচীশ ননিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসায় যেন নতুন করে মায়ের আদর পান, তাই বলেন,

> "তুমি আসিয়াছ, এখন আমার ঘরের শ্রী ফিরিবে, আর পাগলা জগাইও মানুষের মতো হইয়া উঠিবে।"[১০২]

'পাগলা' শব্দটি যদিও নিন্দাসূচক শব্দ তবু এখানে নিজের প্রতি পরম ভালোবাসায় শব্দটিকে উচ্চারিত হতে শুনি। এই জগমোহনই আবার তীব্র ভাবে রেগে ওঠেন যখন তাঁর ভাই তাঁর কাছে অন্যায় দাবি নিয়ে আসেন, বলেন, -

> "বটে! তুমি তোমার এঁটো পাতের অর্ধেক আমাকে দিয়া কুকুর ভুলাইতে আসিয়াছো!"[১০৩]

শচীশের পিতা শচীশের কাছে জানতে চান তার কাজ কি "পাড়ার চামার গুলোর মুর্দফরাশির কাজ?"[১০৪] শচীশ সবিনয়ে ইতিবাচক উত্তর দিলে, তার পিতা ক্ষেপে উঠে বলেন, "'আজ্ঞা হাঁ' বৈকি! যদি দরকার হয় তবে তুমি তোমার চৌদ্দপুরুষকে নরকস্থ করিতে পার। পাজি! নচ্ছার! নাস্তিক!"[১০৫] খেয়াল করতে হবে, তথাকথিত ধার্মিকের কাছে 'নাস্তিক' গালাগালি বিশেষ।

মনে রাখতে হবে কথাসাহিত্য ও কবিতার চেয়ে হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুকে রবীন্দ্রনাথ অপভাষা ও নিন্দাসূচক শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন বেশি, সেটা হাস্যরস সৃজনের জন্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্যঙ্গকৌতুকের 'স্বর্গীয় প্রহসন'[১০৬] - এ যেহেতু স্বর্গের দেবতাদের আদি ও নব্য দুই ভিন্ন ধারা ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গ এসেছে তাই সেখানে একই সঙ্গে পেয়েছি 'অয়ি কোপনে', 'অহো দুর্‌বৃত্তা নিয়তি!' থেকে শুরু করে 'মাইরি', 'মিনসে', 'আ মর মাগী' প্রভৃতি ভিন্ন প্রকারের অপভাষা। মনসা ইন্দ্রের সংস্কৃত জর্জরিত ভাষা বুঝতে না পেরে ঘেঁটুকে বলেছে, 'মিন্‌সে কী বকছে ভাই?'[১০৭] আবার ঘেঁটুকে ইন্দ্র সংস্কৃত সম্বোধনে ডাকলে ঘেঁটু চটে ওঠে,

> "ঘেঁটো কী! আমি কি তোমার বাগানের মালী? বাপের জন্মে এমন অভদ্দর মানুষ তো দেখি নি গা! ঘেঁটো!"[১০৮]

অর্বাচীন কালের দেব দেবীদের স্বর্গে গিয়ে চ্যাং মাছ ধরার চেষ্টা কিংবা তেঁতুল দিয়ে পদ্মফুল রেঁধে খাওয়ার প্রসঙ্গ ফুরোতে না ফুরোতেই আবার 'চিত্তিরে হয়!'[১০৯] শীতলা চাঁদকে বলেন, "মাইরি! তুমি এত ছলও জান ভাই। আমাকে আচ্ছা ভোগ ভুগিয়েছ যা হোক।"[১১০] স্বর্গের অন্দরমহলে অশ্লেষা আর মঘা নবাবপুত্রীর মতো বসে আছে দেখে শীতলা জ্বলে উঠে বলে, "বলি ও বড়োমানুষের ঝি, তোমাদের গতর খাটিয়ে খেতে হয় না বলে বুঝি দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না!"[১১১] দ্বন্দ্ব যে কেবল ঐতিহ্যবাহী দেবতাদের সঙ্গে নব্য গোষ্ঠীর তা নয়, দ্বন্দ্ব নিজেদের মধ্যেও, শীতলা তাই মনসা সম্পর্কে বলে, "মোলো মোলো! আমাদের মন্‌সে হিংসেয় ফেটে মোলো। আমি চাঁদের পাশে বসেছি, এ আর ওঁর গায় সইল না।"[১১২] 'মাগী'র কার্তিক-ঠাকুরটিকে নিয়ে 'নিলজ্জপনায়' শীতলা লজ্জায় মরে যায় আর-কি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 772 - 787
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"ঐ তো চেহারা, ঐ নিয়ে এত ভঙ্গিও করে! মাগো, মাগো, মাগো! (প্রকাশ্যে) আ মর্ মাগী! চাঁদের সামনে দিয়ে অমন বেহায়ার মতো আনাগোনা করছিস কেন?"[১১৩]

ঘেঁটু আবার ইন্দ্রের সঙ্গে দাদা ভাইয়ের সম্পর্ক পাতানোর সূত্র ধরে বলেছে, "মাইরি দাদা, ঢের ঢের পুরুষ-মানুষ দেখেছি, কিন্তু তোর মতো এমন স্ত্রৈণ আমি দেখি নি।"[১১৪]

ব্যঙ্গকৌতুকের 'হেঁয়ালি নাট্যে'[১১৫] Nonsense, Hypocrisy, Clever, Ignorance প্রভৃতি ইংরেজি নিন্দাসূচক শব্দ পেয়েছি; সেখানেই আবার পেলাম, "যারা কথায় কথায় তর্ক উঁচিয়ে খেঁকিয়ে আসে, তাদের একরকম সংকীর্ণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকতে পারে বটে, কিন্তু তারা ভদ্র নয়।"[১১৬]

'একান্নবর্তী'[১১৭] হাস্যকৌতুকে একান্নবর্তী পরিবারে স্বার্থত্যাগের শিক্ষা নিয়ে বক্তৃতা করে আসার পর দিনই দৌলতের বাড়িতে প্রচুর আত্মীয়ের আগমন হয়, দৌলতের বিয়ে না হলেও নটবর নিজেকে তার শালা বলে দাবি করে। দৌলতের কান মলে সে বলে, "কী রে শালা! শুনলুম না কি শালার শোকে সভায় দাঁড়িয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিস?"[১১৮] স্বাভাবিক ভাবেই দৌলত এর প্রতিবাদ করে, "কে হে তুমি বেল্লিক! ভদ্রলোকের কানে হাত দাও!"[১১৯] শেষ পর্যন্ত সে দাবি করে, সে তার দাদার শালা, এবং বলে, "ভদ্রলোক বসে আছেন, এঁর সামনে কে শালা আর কে শালা নয় তা নিয়ে তক্‌রার করা ভালো দেখায় না।"[১২০] এই নাটকেই জয়নারায়ণের খুড়তুতো ভাইয়ের দুই স্ত্রী এসে বিষম ঝগড়া লাগায়। প্রথমা পত্নী বলে, "পোড়ারমুখো তোমার মরণ হয় না!"[১২১] লোকের বাড়ি এসেই সে তার মুখের বাঁধন খুলে দেয়, "ও আবাগের বেটা ভূত!"[১২২] সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয়া চিৎকার করে "মার্ ঝাঁটা, মার্ ঝাঁটা!"[১২৩] দৌলতের তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত। বন্ধু কানাই তাকে তারই বক্তৃতার সুর ধরে বলে সহিষ্ণুতা শিক্ষার এত বড় ক্ষেত্র সে আর পাবে না। ইতিমধ্যেই প্রথম বৌটি চেঁচাতে শুরু করেছে তার স্বামীর প্রতি, "মিন্‌সে তুমি বুড়োবয়সে আক্কেল খুইয়ে বসেছ!"[১২৪] এতে দ্বিতীয়া পোঁ ধরে, "ওগো, এত লোকের এত স্বামী মরছে, যমরাজ কি তোমাকেই ভুলেছে!"[১২৫] বুক ধরফর্ করায় দৌলত এদের একটু ঠাণ্ডা হতে বলেছিল, কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত ঘটে, দুই বৌ একসঙ্গে চেঁচাতে থাকে, "ঠাণ্ডা হব কিরে মিন্‌সে। তুই ঠাণ্ডা হ, তোর সাত পুরুষ ঠাণ্ডা হয়ে মরুক।"[১২৬]

চতুরঙ্গ[১২৭] ও *গোরা* [১২৮]- র মতো উপন্যাস বাদ দিলে, সেখানে চরিত্রের প্রয়োজনে নিন্দাসূচক শব্দ আনা হয়েছে, তাছাড়া সাধারণভাবে উপন্যাসে বা ছোটগল্পে পরের দিকে অপভাষা এবং নিন্দা সূচক শব্দের প্রয়োগ তেমনভাবে আসেনি। এমন প্রসঙ্গও আর তেমনভাবে আসেনি তাই ব্যবহারের দরকারও পড়েনি। শিলাইদহ পর্বে এই ধরনের শব্দের প্রয়োগ বেশি পাওয়া যায়, এর পরবর্তী সময় শান্তিনিকেতন পর্বে কিন্তু তেমনভাবে কোন অপভাষার প্রয়োগ আমরা রবীন্দ্রনাথের গল্প, উপন্যাসে পাচ্ছি না, কারণ তখন তিনি গুরুদেব এবং একই সঙ্গে বিশ্বকবি। আন্তর্জাতিক খ্যাতি এসে গেছে, নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেছেন এবং ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়ে গেছে, তাই বিশ্বকবি, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এমন কোন শব্দের প্রয়োগ আর তেমনভাবে আমরা পাবো না তাঁর পরবর্তী যুগের কথাসাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ ও অনুজ সাহিত্যিকরা স্ল্যাং ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক স্বচ্ছন্দ ছিলেন - এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করছেন তন্ময় ভট্টাচার্য তাঁর "স্ল্যাং - এর উদাহরণ রয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যেই, বাদ যাননি বঙ্কিম-শরৎ, এমনকি বিবেকানন্দও'[১২৯] রচনায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক ক্ষেত্রেই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অপভাষার প্রয়োগ করেন নি, সযত্নে এড়িয়ে গেছেন, যেমন 'বিচারক'[১৩০] গল্পে পাই "ক্ষীরোদা অকস্মাৎ দ্বার খুলিয়া ঝাঁটাহস্তে বাঘিনীর মতো গর্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল;" (১৩১) কিন্তু ঐ পর্যন্তই, এখানে কোন অপভাষার প্রয়োগ নেই। আবার যখন বিচারক ক্ষীরোদার ঝগড়া শুনছেন সেখানেও আশ্চর্য সংযমের প্রয়োগ দেখি, "মোহিত মনে মনে হাসিলেন; ভাবিলেন, স্ত্রীলোকের স্বভাবই এমনিই বটে! মৃত্যু সন্নিকট তবু ঝগড়া করিতে ছাড়িবে না। ইহারা বোধ করি যমালয়ে গিয়া যমদূতের সহিত কোন্দল করে।"[১৩২] কিংবা *যোগাযোগ* [১৩৩] উপন্যাসে কুমুর বিবাহ প্রসঙ্গে, কুমুর সম্পর্কিত কাকা মধুসূদনদের সঙ্গে অবনিবনা হওয়ায় 'ভাষার প্রাবল্যে নবগোপালের আপত্তি প্রায় লাঠিয়ালির কাছ পর্যন্ত এসে তবে থেমেছিল।'[১৩৪] সব আছে, কিন্তু অপভাষার প্রয়োগ এখানে নেই।

জীবনের উত্তর কালপর্বে রবীন্দ্রনাথ শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে আরো বেশি করে সচেতন। চিঠিপত্র বা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কারোর মতের বিরোধিতা যখন করেছেন তখনও শব্দ প্রয়োগের বিষয়ে তিনি অত্যন্ত মৃদুতা বজায় রাখছেন। রবীন্দ্রনাথের

OPEN ACCESS Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 772 - 787
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চিঠিপত্র পড়লে এই প্রসঙ্গগুলি আমরা বুঝতে পারি। তাঁর লেখায় আলগা কথা প্রায় নেই বললেই চলে। ব্রাহ্মশুচিতা বোধ, পারিবারিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, তিনি যে বৃত্তে বিরাজ করেছেন সেখানে স্থিত থেকে তাঁর পরবর্তী যুগের লেখায় নিম্নবর্গের চরিত্র তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প এবং নাটকে অনেক কম এসেছে - যাদের মুখে অপভাষা প্রয়োগের প্রয়োজন পড়বে।শিলাইদহ পর্বের পর তাঁর রচনায় একেবারে নিম্নবর্গের চরিত্র অপেক্ষাকৃত কম। তাঁর শেষ পর্বে লেখা উপন্যাস শেষের কবিতা (১৩৫)-তে মধ্যবিত্ত মানুষের কথা এসেছে। তেমনভাবে নিম্নবর্গীয় জীবন কিন্তু সেখানে আর নেই। ব্রাহ্ম শুচিতার আদর্শ এবং রুচিশীলতা রবীন্দ্রনাথের উপর অবশ্যই কাজ করেছিল, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের সীমানা কে বাড়াতে পেরেছিলেন, তাই চরিত্রের দাবিতে চরিত্রের মুখের ভাষা রূপেই নিন্দাসূচক শব্দগুলি এসেছে, নইলে চরিত্রগুলো জীবন্ত হতো না। তিনি যে নিজের সীমানাকে ভাঙলেন তা অবশ্যই চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনে, চরিত্রের বাস্তবতার প্রয়োজনে। এই ভাষা উঠে না এলে চরিত্রগুলো জীবন্ত হতো না। মাটির কাছাকাছি থাকা চরিত্রদের আচার-আচরণ প্রকাশ করতে গেলে তাদের সংলাপে এই ধরনের অপভাষা ও নিন্দা সূচক শব্দের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই ধরনের শব্দ ব্যবহার না রাখলে তাদের রাগ, ক্রোধ, হতাশা, অসহায়তা ও বিক্ষোভ যেন বিশ্বাসযোগ্য ভাবে উঠে আসত না।

গালি বা অপভাষা প্রয়োগের প্রসঙ্গটি রবীন্দ্রনাথের জীবন দিয়ে অনুভূত সত্য, কেন মানুষ গালি ব্যবহার করে, করে কী আনন্দ পায়, বা কীসের জ্বালা মেটে তা তিনি অনুভব করেছিলেন ছোট বয়সেই। নর্মাল স্কুল ছেড়ে বেঙ্গল একাডেমিতে ভর্তি হয়ে বুঝেছিলেন এখানকার ছাত্ররা দুর্বৃত্ত কিন্তু ঘৃণ্য নয়। তাদের মজা করার ধরন প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতিতে[১৩৬] বলছেন, "তাহারা হাতের তেলোয় উল্টা করিয়া ass লিখিয়া, 'হেলো' বলিয়া যেন আদর করিয়া পিঠে চাপড় মারিত, তাহাতে জনসমাজে অবজ্ঞাত উক্ত চতুষ্পদের নামক্ষরটি পিঠের কাপড়ে অঙ্কিত হইয়া যাইত।"[১৩৭] অনেক বয়সে পৌঁছে পঞ্চভূতের 'কৌতুক হাস্য'[১৩৮] প্রবন্ধে লিখেছেন, -

> "কৌতুক মনের মধ্যে হঠাৎ আঘাত করিয়া আমাদের সাধারণ অনুভবক্রিয়া জাগ্রত করিয়া দেয়। এই জন্য অনেক রসিক লোক হঠাৎ শরীরে একটা আঘাত করাকে পরিহাস জ্ঞান করেন; অনেকে গালিকে ঠাট্টার স্বরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন;"[১৩৯]

বিচিত্র মানুষ আর বিচিত্রতর তার আনন্দ অনুভব ও রাগ-দ্বেষ প্রকাশের ধরন - উভয়তই মানুষ গালি প্রয়োগ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় হয়েছেন ঠাকুর বাড়ির মার্জিত রুচিশীল পরিবেশে। তাঁদের পরিবার তখনকার সময়ে কেবলমাত্র অর্থবান ও অভিজাত রূপেই প্রতিষ্ঠিত ছিল না, কালের থেকে এগিয়ে থাকা মন ও মানসিকতার কারণে এবং বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রুচিশীল অবদানের জন্যই সে পরিবারের প্রকৃত পরিচয়। এরই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিবারের ব্রাহ্ম মতাদর্শ তাঁদের জীবন যাপনে ও কথাবার্তায় ভীষণ ভাবে ছাপ রেখে গেছে। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ফলে শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে সংযম তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই লক্ষ করা যায়। সাহিত্য জগতে অনেক নিন্দাবাদ ও সমালোচনার শিকার হয়েও রবীন্দ্রনাথ কখনও তার উত্তরে রুচিহীন প্রতিক্রিয়া জানান নি। তাঁর প্রবন্ধেও আমরা অপভাষার প্রয়োগ দেখি না। কেবলমাত্র কথাসাহিত্যে ও নাটকে চরিত্রের বাস্তবতার প্রয়োজনেই তিনি অপভাষা ব্যবহার করেছেন, এবং এই প্রবন্ধে আমরা এটাই দেখাতে চাইলাম যে সে প্রয়োগ এতটাই চরিত্রের সঙ্গে মিশে গেছে যে তা যেন আলাদা করে চোখে পড়ে না। রুচিশীল, সৃজনদক্ষ এই মানুষটি তাঁর আদর্শনিষ্ঠা ও পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শিক্ষার জন্যই কখনও নিজের স্বার্থে নিন্দাসূচক শব্দ ব্যবহার করেন নি, কিন্তু যেখানে তিনি স্রষ্টা সেখানে চরিত্রের দাবি, বাস্তবতার দাবিই তাঁর কাছে মহত্তম, তাই সেই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে তিনি অনায়াসেই চরিত্রের মুখে বসিয়েছেন ইতর ভাষা, গালিগালি এবং তা তাঁর কথাসাহিত্য ও নাটককে বাস্তব ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড় করিয়েছে।

Reference:

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 772 - 787
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ঘরে-বাইরে,* রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮

২. তদেব, পৃ. ৪৫৫

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শাস্তি, *গল্পগচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক-১৪২৪

৪. তদেব, পৃ. ১৬৭

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গুরুবাক্য, *হাস্যকৌতুক,* রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮

৬. তদেব, পৃ. ১৪৩

৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সমাপ্তি, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক-১৪২৪

৮. তদেব, পৃ. ১৮০

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ঘরে-বাইরে,* রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৫৪৯

১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চিরকুমার সভা,* রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, ষষ্ঠখণ্ড, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮

১১. তদেব, পৃ. ৬৯৯

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গোরা,* নবম খণ্ড, রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮

১৩. তদেব, পৃ. ৮৭

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সম্পত্তি সমর্পণ, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক-১৪২৪

১৫. তদেব, পৃ. ৪৪

১৬. তদেব, পৃ. ৪৪

১৭. তদেব, পৃ. ৪৪

১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চিরকুমার সভা,* রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮

১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক-১৪২৪

২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *যোগাযোগ,* রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮

২১. তদেব, পৃ. ৬৮৭

২২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক-১৪২৪

২৩. তদেব, পৃ. ২৭

২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র – ভারতী, কলকাতা, বৈশাখ ১২৮৬ – শ্রাবণ ১২৮৭

২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দুই বিঘা জমি, *কথা ও কাহিনী,* রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮

২৬. তদেব

২৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র* – প্রথম খণ্ড, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, ভাদ্র- ১৪২২

২৮. তদেব, পৃ. ৮১৪

২৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দুরাশা, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক-১৪২৪

৩০. তদেব, পৃ. ৩২৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 772 - 787
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩১. তদেব, পৃ. ৩২৪
৩২. তদেব, পৃ. ৩২৭
৩৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পুরাতন ভৃত্য, *কথা ও কাহিনী,* রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮
৩৪. তদেব, পৃ. ৬৭৭
৩৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মুকুট, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক, ১৪২৪
৩৬. তদেব, পৃ. ৯০৪
৩৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দুই বিঘা জমি, *কথা ও কাহিনী,* রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা,২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮
৩৮. তদেব, পৃ. ৬৭৯
৩৯. তদেব, পৃ. ৬৮০
৪০. শ্লোক-রামায়ণ
৪১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দুই বিঘা জমি, *কথা ও কাহিনী,* রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮
৪২. তদেব, পৃ. ৬৭৯
৪৩. তদেব, পৃ. ৬৮০
৪৪. তদেব, পৃ. ৬৮০
৪৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গিন্নি, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক, ১৪২৪
৪৬. তদেব, পৃ. ২২
৪৭. তদেব, পৃ. ২২
৪৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক, ১৪২৪
৪৯. তদেব, পৃ. ২৫
৫০. তদেব, পৃ. ২৫
৫১. তদেব, পৃ. ২৫
৫২. তদেব, পৃ. ২৬
৫৩. তদেব, পৃ. ২৬
৫৪. তদেব, পৃ. ২৭
৫৫ তদেব, পৃ. ২৬
৫৬. তদেব, পৃ. ২৭
৫৭. তদেব, পৃ. ২৭
৫৮. তদেব, পৃ. ২৮
৫৯. তদেব, পৃ. ২৮
৬০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক, ১৪২৪
৬১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সমাপ্তি, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক, ১৪২৪
৬২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছেলেভুলানো ছড়া, *লোক সাহিত্য,* বিশ্বভারতী, কলকাতা।
৬৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চিরকুমার সভা,* বিশ্বভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯২৬
৬৪. তদেব, পৃ. ৬৯৬
৬৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দালিয়া, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক, ১৪২৪

৬৬. তদেব, পৃ. ৫১
৬৭. তদেব, পৃ. ৫৪
৬৮. তদেব, পৃ. ৫৩
৬৯. তদেব, পৃ. ৫৩
৭০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সমাপ্তি, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক-১৪২৪
৭১. তদেব, পৃ. ১৭৯
৭২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রোগের চিকিৎসা, *হাস্যকৌতুক,* ষষ্ঠ খণ্ড, রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮
৭৩. তদেব, পৃ. ১০২
৭৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছাত্রের পরীক্ষা, *হাস্যকৌতুক,* বিশ্বভারতী, কলকাতা।
৭৫. তদেব, পৃ. ৯৪
৭৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দুই বিঘা জমি, *কথা ও কাহিনী,* রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮
৭৭. তদেব, পৃ. ৬৭৯
৭৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রোগীর চিকিৎসা, *হাস্যকৌতুক,* রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮
৭৯. তদেব, পৃ. ১০৩
৮০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চিরকুমার সভা,* রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড) জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৬৯৬
৮১. তদেব
৮২. তদেব, পৃ. ৬৯৭
৮৩. তদেব, পৃ. ৬৯৭
৮৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চিরকুমার সভা,* রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড) জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮
৮৫. তদেব, পৃ. ৭০০
৮৬. তদেব, পৃ. ৭০০
৮৭. তদেব, পৃ. ৭০০
৮৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কাবুলিওয়ালা, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক-১৪২৪
৮৯. তদেব, পৃ. ১১৮
৯০. সংস্কৃত শ্লোকাংশ
৯১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক-১৪২৪
৯২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মধ্যবর্তিনী, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক-১৪২৪
৯৩. তদেব, পৃ. ১৫৫
৯৪. তদেব, পৃ. ১৫৮
৯৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শাস্তি, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক, ১৪২৪
৯৬. তদেব, পৃ. ১৭১
৯৭. তদেব।

৯৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চতুরঙ্গ,* রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮
৯৯. তদেব, পৃ. ৩৬৪
১০০. তদেব, পৃ. ৩৬২
১০১. তদেব, পৃ. ৩৫৪
১০২. তদেব, পৃ. ৩৬১
১০৩. তদেব, পৃ. ৩৬৪
১০৪. তদেব, পৃ. ৩৬৭
১০৫. তদেব, পৃ. ৩৬৭
১০৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্গীয় প্রহসন, *ব্যঙ্গ কৌতুক,* রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮
১০৭. তদেব, পৃ. ১৬৪
১০৮. তদেব, পৃ. ১৬৫
১০৯. তদেব, পৃ. ১৬৫
১১০. তদেব, পৃ. ১৬৫
১১১. তদেব, পৃ. ১৬৫
১১২. তদেব, পৃ. ১৬৬
১১৩. তদেব, পৃ. ১৬৬
১১৪. তদেব, পৃ. ১৬৭
১১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, হেঁয়ালি নাট্য, *হাস্যকৌতুক,* রবীন্দ্র রচনাবলী, https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/15209
১১৬. তদেব, https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/15209
১১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, একান্নবর্তী, *হাস্যকৌতুক,* রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮
১১৮. তদেব, পৃ. ১২৫
১১৯. তদেব, পৃ. ১২৫
১২০. তদেব, পৃ. ১২৫
১২১. তদেব, পৃ. ১২৬
১২২. তদেব, পৃ. ১২৬
১২৩. তদেব, পৃ. ১২৬
১২৪. তদেব, পৃ. ১২৬
১২৫. তদেব, পৃ. ১২৬
১২৬. তদেব, পৃ. ১২৬
১২৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চতুরঙ্গ,* রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৬১
১২৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গোরা,* রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮ ১২৯. https://www.prahar.in August 23, 2021.

১৩০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিচারক, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক, ১৪২৪

১৩১. তদেব, পৃ. ২৩২

১৩২. তদেব, পৃ. ২৩৮

১৩৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *যোগাযোগ*, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮

১৩৪. তদেব

১৩৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *শেষের কবিতা*, নবম খণ্ড, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮

১৩৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*, বিশ্বভারতী, বিদ্যালয় পাঠ্য সংস্করণ, কলকাতা, মাঘ, ১৩৮২

১৩৭. তদেব, পৃ. ৪২

১৩৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কৌতুক হাস্য, *পঞ্চভূত*, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮

১৩৯. তদেব, পৃ. ৬৮৭